OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 47
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 403 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 403 - 410
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা শব্দ ভাণ্ডার : প্রসঙ্গ ব্রতপার্বণের নামকরণ ও তার উৎস সন্ধানে

ড. সুধাংশু কুমার সরকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজ
Email ID: sudhangshusarkar37@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Classical, primitive, popular, folk, heritage, vocabulary, brata, bratakatha, festival, social origins, antiquity, religion, ritual, festival.

Abstract

The Bengali language is now recognised as one of the classical languages of India. This raises the question: what criteria must a language fulfil in order to attain the status of a classical language? We may say that a language attains classical status when it possesses antiquity, excellence, and cultural prestige. The extent to which these qualities are reflected in the collective consciousness of the people, folk literature, folk mythology, folk culture, refined literature, music, and the arts may be considered as important criteria for evaluating such characteristics. There is no longer any doubt that the Bengali language has undoubtedly fulfilled all these criteria. In this context, the present article seeks to explore the naming of various brata observances and festivals practised in the rural life of Bengal, along with the etymological meanings of their associated terms and their social contexts. Accordingly, we have entitled our project "Bengali Vocabulary: In Search of the Naming and Origins of Brata Festivals."

Just as every individual has their own language, every folk community likewise possesses its own distinctive linguistic expressions. Here, the term 'folk' refers to people. It may be said that human speech is limited, whereas the thoughts and emotions within the human mind are infinite. With this limited vocabulary and language, people create countless comprehensible words and expressions. Therefore, the contribution of the folk and folk communities to the creation and development of language is immeasurable. Needless to say, folk communities have nurtured and enriched the Bengali vocabulary over a long period of time.

The spontaneous expression of the vitality inherent in Bengali language and culture is rooted in women's brata rituals, popular religious observances and festivals, village names or place names, and collective folk festivals, among other practices. The Bengali language possesses an extraordinarily rich vocabulary, and bratakatha occupies a special place within it. Bratakatha is a unique form of folk culture, primarily associated with religious and social

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 47
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 403 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

rituals and ceremonies in the rural society of Bengal. In any case, in accordance with the title of our article, we shall attempt to discuss the subject from this particular perspective.

Finally, it may be said that bratakatha is not merely a religious ritual; it constitutes an important chapter in the history of Bengali society, culture, and language. An exploration of its origins provides us with an opportunity to delve deeper into the history of Bengali language and culture. Therefore, through the study and research of bratakatha, we can develop a richer understanding of our cultural heritage.

Discussion

আজ যে পশ্চিমবঙ্গ বা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ দেখছি তা দেড়-দুহাজার বছর পূর্বে তার ভৌগোলিক সীমারেখা সমরূপে ছিল না। বলা হয়ে থাকে সে কালের রাঢ়দেশ আজকের পশ্চিমবঙ্গ, সেকালের কামরূপ বা কামতাবেহার আজকের প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গ, সেকালের প্রাগজ্যোতিষ্পুর পরবর্তীকালে বারেন্দ্রভূমি আজকের গৌড়বঙ্গ বা মালদা-দিনাজপুর। এই গৌড় নামটি পাণিনির সূত্রেও পাওয়া যায়। কালিদাস, দণ্ডী প্রমুখ পণ্ডিতেরা বঙ্গের পরিচিতি সুহ্ম নামে দিয়েছেন। কাজেই আজকের এই বঙ্গভূমি অনেক ভাঙ্গাগড়ার মধ্যদিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষা ও জাতি হিসেবে গড়ে উঠেছে। কেউ কেউ বলে থাকেন চোয়াড়রাই হলেন বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী। কালক্রমে এই ধারার সঙ্গে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর নানাজাতি উপজাতির মিশ্রণ ঘটেছে এবং শেষ পর্যায়ে এসে মিলিত হয়েছে আর্যধারা। সুতরাং গত দেড়-দু হাজার বছর ধরে এতদ্বঞ্চলে যে ভাষা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা নিঃসন্দেহে এক মিশ্র-সংস্কৃতি। কাজেই বৈচিত্র্যে ভরা এই বঙ্গসংস্কৃতি কোনোপ্রকার আলোচনা করা একটি দূরহতম কাজ। বাঙালি আজ যে সংস্কৃতি বহন করে চলেছে তা এককথায় অনার্য ও আর্য সংস্কৃতির মিলিত ধারার ফসল।

বঙ্গ শব্দটির অর্থ নিয়েও অনেক বিতর্ক আছে। আচার্য সুকুমার সেনের মতে, ফারসী 'বঙ্গাল্হ' থেকে পোর্তগিজ Bangla ও ইংরেজি Bengal এসেছে। তবে বঙ্গ শব্দটির অর্থ মূলত জলাভূমি। বঙ্গ শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঐতরেয় আরণ্যকে। 'বঙ্গাল' শব্দটি এসেছে অনেক পরে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে। যাইহোক, সাধারণ ভাবে বলা যায় বঙ্গজাতির বসতি যেখানে তা হল বঙ্গদেশ। বলাবাহুল্য, 'বঙ্গ' শব্দটি 'বঙ্গাল' হয়ে বর্তমান 'বাংলা' রূপলাভ করেছে।

অন্যদিকে, 'ব্রত' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'বৃ' ধাতু থেকে। বৃ – অত (অতক্) = ব্রত। যার অর্থ সংকল্প বা কোনো ধর্মীয় প্রতিজ্ঞা। ব্রত পালন মূলত নারীদের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। এসব ব্রতে নারীরা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে উপবাস পালন করে, দেবদেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানায় এবং নির্ধারিত মন্ত্র বা গান আবৃত্তি করে। এই গানগুলোকেই বলা হয় ব্রতকথা বা ব্রতের গান। আবার কেউ কেউ বলেছেন ব্রত কথাটি এসেছে ব্রাত্য বা পতিত থেকে। বিশেষ করে আর্য-ব্রাহ্মণগণ যাঁরা ব্রত পালন করেন তাঁরা ব্রাত্য বলে অভিহিত হয়েছেন। এ বিষয়ে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—

> "ঋগবেদীয় আর্যরা ছিলেন যজ্ঞধর্মী; যজ্ঞধর্মী আর্যদের বাহিরে যাঁহারা ব্রতকর্ম পালন করিতেন, ব্রতের গুহ্য জাদুশক্তি বা ম্যাজিকে বিশ্বাস করিতেন তাঁহারাই হয়তো ছিলেন ব্রাত্য। এই ব্রাত্যরা যে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে জড়িত তাঁরা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য এবং ইহাও লক্ষণীয় যে, ব্রতধর্মের প্রসার বিহার, বাংলা, অসম এবং উড়িষ্যাতেই সবচেয়ে বেশি। ...ব্রতানুষ্ঠানে আলপনা দিয়া অথবা বৃত্তাকারে সীমারেখা টানিয়া ব্রতস্থান নির্বাচন করিয়া লওয়া হয়; এই সীমারেখা টানা স্থান নির্বাচন বা চিহ্নিত করার মধ্যে জাদুশক্তি বা ম্যাজিকের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন। ...এই ম্যাজিক-বিশ্বাসী ব্রতচারী লোকেরাই ঋগ্বেদীয় আর্যদের চোখে বোধহয় ছিলেন ব্রাত্য।"[১]

জাতিভেদের জন্য শুধু যে আর্যশক্তির নিকট পরাজিত হয়েছে তাই নয়। এর ফলে তাঁরা আর কি হারিয়েছে তা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 47
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 403 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "এই জাতিভেদের দরুন ভারতের অধিকাংশ লোক তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বিশ্বমানবকে দিয়া যাইতে পারে নাই, ভারতের সেই অধিকাংশ লোক শূদ্র। নারীরাও শূদ্রের সামিল। তবু ভারতে নারী ও শূদ্রদের কিছু কিছু সম্পদের যেখানে পরিচয় পাওয়া যায় তাতেই বিস্মিত হতে হয়।"[২]

তবে পাশাপাশি তিনি একথাও বলেছেন যে ভারতীয় সভ্যতা আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলেই গড়ে উঠেছে এবং তা স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়।

> "ভারতীয় সংস্কৃতিতেও আর্য ও আর্যেতর দুই ধারার দুই রঙ দেখা যায়। দুয়ের নিজ নিজ মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে। আর্যরা প্রধানত জ্ঞানপন্থী, আর্যেতরেরা ভাবপন্থী।"[৩]

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মনে করেন ভারতীয় চৌষট্টিকলার অধিকাংশ কলাই আর্যপূর্বসংস্কৃতির। গান ও আনুষঙ্গিক বাদ্য ইত্যাদিকে পুরাণে নারী ও শূদ্রদের বিদ্যাই বলা হয়েছে। আর্যদের মধ্যে অনুলোম বিবাহের ফলে এই কর্মটি সমাধা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। এক্ষণে উদাহরণ স্বরূপ আমরা উল্লেখ করতে চাই যে ভারতীয় ধর্মে যে শৈবপূজার ধারণা এটাও আর্যেতর সংস্কৃতির দান। মুনিপত্নীদের শৈবপূজায় এত উৎসাহের কারণ শুধুই কি কামুকতার প্রাধান্যের জন্য হয়েছিল? এর উত্তরে বলা যায় কামুকতা অনেকাংশে সত্য হলেও সর্বাংশে নয়। বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার করা যাক। ভারতীয় মুনিপত্নীদের অনেকেই ছিলেন শূদ্রকন্যা। তাই তাঁদের মাতৃকুলের প্রচলিত দেবতার উপাসনা স্বামীগৃহে এসেও বিস্মৃত হতে পারেননি। কালে কালে এইভাবে শৈব উপাসনা আর্যসংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর্যরা অনার্যদের অনেক দেবতাকেই অস্বীকার করতে পারেননি। দীর্ঘদিনের পারিপার্শ্বিকের প্রভাব ও অনুশীলনকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষত তা যদি আচার-সংস্কারের মধ্যে থাকে। তাছাড়া আর্যদের মধ্যে ক্ষমতার দম্ভ ছিল। সুতরাং ক্ষমতাকে কায়েম রাখতে হলে গণদেবতা সন্তুষ্ট রাখতে হবে। সুতরাং শিব কিন্তু এই গণেরই দেবতা। অর্থাৎ, সাধারণ লোকপূজ্য দেবতা। আবার বিষ্ণুও গণদেবতা, তাই তাঁর নাম লোকনাথ, গণেশ্বর, লোকবন্ধু। মহাদেবের প্রায় নামই এই বিষ্ণু সহস্র নামে দেখা যায়।[৪] বর্তমানে অবশ্য গণাধিপ, গণপতি, গণাধ্যক্ষ ইত্যাদি বলতে গণেশকে বোঝায়। দক্ষযজ্ঞানুষ্ঠানে দক্ষের সঙ্গে শিবের যে বিরোধ সেখানেও ছিল আর্য বেদাচার সংস্কৃতি বনাম আর্যেতর শিবোপাসনা। দক্ষের যজ্ঞে মহাদেব নিমন্ত্রিত না হওয়ার তাঁর অনুচরেরা অর্থাৎ ভূতপ্রেত দ্বারা যজ্ঞস্থান ভূলুণ্ঠিত হয়। এতে করেও ধারণা করা যায় শিব অনার্যের দেবতা। পুরাণেও বলা হয়েছে শিব কিরাতবেশী, শবরপূজিত, শিবানী শবরীমূর্তি ইত্যাদি।

সুতরাং ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি প্রাচীন ও জটিল একটি বিষয়। তবে একটি বিষয়ে সকলেই একমত তাহল ব্রতের মধ্যে ব্রতীর কামনা সক্রিয় থাকে। ব্রত হল মানুষের কামনার অনুষ্ঠান। কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে এসেছে তাকেই ব্রত বলা যায়।[৫] আবার বাংলার ব্রতগুলিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে ব্রতের মধ্যে সাধারণত চারটি পর্যায় বা স্তর থাকে, যেগুলির মধ্য দিয়ে ব্রতকর্ম সমাপ্ত হয়। সেগুলি যথাক্রমে আহরণ, আচরণ, কামনা ও কথা বা কাহিনি।[৬] আহরণ অর্থাৎ, ব্রত করতে যে সমস্ত উপকরণ বা উপাদান সংগ্রহ করার প্রয়োজন পড়ে; আচরণ অর্থাৎ কামনার প্রতিচ্ছবি বা মূর্তি, পুকুরকাটা, আলপনা দেওয়া ইত্যাদি; কামনা অর্থাৎ মনস্কামনা জানিয়ে মূর্তি বা প্রতিকৃতিতে ফুলধরা, প্রণাম করা ইত্যাদি এবং সবশেষে যদি এই ব্রতের কোনো কথা বা কাহিনি থাকে তা উপস্থিত সকলকে শোনানো। এই চারটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ব্রতকথাগুলি সম্পন্ন হয়ে থাকে। পুজারি বা তন্ত্রমন্ত্রের জায়গা এখানে প্রায় নেই বললেই চলে।

ব্রতকথার উৎস গভীরভাবে প্রোথিত বাংলার প্রাচীন লোকজ সংস্কৃতিতে। এটি আদিম কৃষি সমাজ থেকে উদ্ভূত বলে ধারণা করা হয়, যেখানে প্রকৃতি, ফসল, ঋতু, ও দেব-দেবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তুলে ধরা হত। মূলত ব্রতকথার মধ্যে বৈদিক ধর্ম, লোকায়ত ধর্ম এবং তান্ত্রিক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

ব্রতকথার বৈশিষ্ট্য :

১. প্রার্থনার ভাষা : ব্রতকথার ভাষা সহজ ও সরল, যা সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। এতে ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা পাওয়া যায়।

২. গীতিধর্মিতা : ব্রতকথার অধিকাংশই গানের আকারে রচিত, যা সহজেই মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 47
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 403 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩. লোকজ জ্ঞান : এতে কৃষি, ঋতুচক্র, দৈনন্দিন জীবন এবং নারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

> "ব্রত হল মনস্কামনার স্বরূপটি। আলপনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি; এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে নৃত্যে; এককথায়, ব্রতগুলি মানুষের গীত কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত কামনা।"[৭]

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত যে প্রাণের প্রকাশ তার মূল আধার আমাদের মেয়েলি ব্রত আচার, লৌকিক পূজা-পার্বণ, গ্রামনাম বা স্থাননাম এবং সমবেত লোকউৎসব ইত্যাদির মধ্যে। বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং এর মধ্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে ব্রতকথা। ব্রতকথা হল লোকজ সংস্কৃতির এক অনন্য রূপ, যা প্রধানত বাংলার গ্রামীণ সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। এক্ষণে আমরা ব্রত-পার্বণগুলি আলোচনায় অভিনিবেশের পূর্বে জানিয়ে রাখি প্রবন্ধের আয়তনের কথা ভেবে ব্রতের কথাগুলি (আখ্যান বা কাহিনি) থেকে বিরত থাকব।

ইতু পূজা : কার্তিক সংক্রান্তিতে ঘটস্থাপন করে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবারে সেই ঘটে যে সূর্য ঠাকুরের পুজা হয় তাই ইতুপূজা নামে পরিচিত। অদিতি তনয় আদিত্যের আরেক নাম মিত্র। অনেকে মনে করেন মিত্র থেকে ইতু কথাটি এসেছে। মিত্র > মিতু > ইতু। মিত্র কথাটির পিছনে একটি কাহিনি আছে। কথিত আছে সূর্যপত্নী সংজ্ঞা সূর্যের তাপ সহ্য করতে অসমর্থ হলে তাঁর পিতা বিশ্বকর্মা সূর্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন। সেই দ্বাদশ খণ্ড ভিন্ন নামে দ্বাদশ মাসে উদিত হয়ে থাকে। যেমন, মাঘ মাসে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য, চৈত্র মাসে বেদজ্ঞ, বৈশাখে তপন, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্রে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতাঃ, কার্তিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে মিত্র, পৌষে বিষ্ণু নামে অভিহিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্বে অগ্রহায়ণ মাস থেকেই বছর গণনা শুরু হত। অগ্রহায়ণ শব্দটির মধ্যেও এ কথার সত্যতা লুকিয়ে আছে। অগ্রে যে হায়ণ বা সময় তাই অগ্রহায়ণ। সুতরাং বছরে প্রথম মাসে জগতের সমস্ত কিছুর যিনি আধার, সেই সূর্যকে পূজা করার রীতি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। বাংলার নারী সমাজ ইতু পূজার মধ্য দিয়ে সেই শাশ্বত সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ভাদুলি ব্রত : ভাদুলি ব্রত ভাদ্র মাসে পালিত হয়ে থাকে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে জলপথই যাতায়াতের একমাত্র ভরসা। তাই বর্ষাকালে বা বর্ষার পরে স্থলপথে এবং জলপথে আত্মীয় পরিজন যাতে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরতে পারে তার জন্যই এই ব্রত বাঙালি নারীরা পালন করে থাকে। ঝড়-জলের রাতে কণ্টকময় বনবাদাড়ে কিংবা নদী ও সমুদ্রপথে পথে জান-মালের কোনরূপ ক্ষতি না হয় সেজন্য নারীরা ভাদুলির মূর্তি, জোড়াছত্র, জোড়া নৌকা এবং তার চারদিকে নদী, সমুদ্র, বনজঙ্গল, হিংস্রজন্তু ইত্যাদির আলপনা এঁকে থাকেন। তারপর একটি কামনার বস্তুতে ফুল হাতে নিয়ে ব্রতের ছড়া বলতে থাকেন। নদীর আলপনায় ফুল ধরে বলেন—

"নদী নদী। কোথা যাও
বাপ মাওয়ের বার্তা দাও।"

পুরাণে উল্লিখিত আছে ভাদ্রমাস যমের মাস। যমকে খুশি করতেই এই ভাদুলি ব্রতের আয়োজন বলে আমাদের ধারণা জন্মে। তাই ভাদ্রমাস থেকেই ভাদুলি শব্দটি এসেছে বলে আমাদের অনুমান।

ঘণ্টাকর্ণ বা ঘেঁটু পূজা : নিম্নবঙ্গ এবং রাঢ়বঙ্গে ঘেঁটু বা ঘণ্টাকর্ণ পূজার বহুল প্রচলন। সাধারণত বয়স্কা মহিলারা ঘেঁটু ঠাকুরের ব্রত পালন করে থাকে। কথিত আছে ঘাঁটু আদিতে স্বর্গের দেবকুমার। সাঙ্ঘাতিক অপরাধের জন্য বিষ্ণু তাঁকে শাপ দিলে পিশাচ কুলে জন্ম হয়। বিষ্ণু বিদ্বেষের কারণে যাতে বিষ্ণু নাম তাঁর কর্ণে প্রবেশ না করে সে জন্য দুইকানে ঘণ্টা বেঁধে বা ঝুলিয়ে রাখতেন। তাই তাঁর নাম হয় ঘণ্টাকর্ণ। নামকরণের পাশাপাশি তাঁর মূর্তিটিও বিচিত্র। একটি অব্যবহৃত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 47
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 403 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আধভঙা হাঁড়ি বা চালভাজার খোলাকে দেবতার আসন করে তার ওপর একতাল গোবর দিয়ে সেই গোবরের মধ্যে কড়ি দিয়ে চোখ মুখ বানিয়ে কপালে তিলকের ফোটা কেটে মূর্তি স্থাপন করা হয়। আসনের উপর দূর্বা আর ভাটকুল ফুল দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও আধভাঙা হাঁড়িকে পিটুলি গোলা দিয়ে চোখমুখ এঁকে ঘাঁটুর প্রতীক তৈরি করা হয়। পূজার সময় কোনো কুলোর উপর হাঁড়িটি উপুর করে রাখা হয়।

ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির দিন খুব ভোরে এই ব্রত পালন করা হয়ে থাকে। সাধারণত তেমাথার পাশে কিংবা জলাশয়ের ধারে পূজার স্থান হিসাবে নির্বাচন করা হয়। পূজা শেষে হাঁড়ির পাশেই কালি তৈরি করে তা ছেলেমেয়েদের কাজল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিশ্বাস এতে চোখের কোন অসুখ করবে না।

অপরদিকে এতাও মনে করা হয় যে ঘেঁটু দেবতা বা ঘণ্টাকর্ণ দেবতা হল সূর্য বা সূর্যের রূপান্তর ধর্মঠাকুর। ফাল্গুনী সংক্রান্তি সূর্যের বিষুব সংক্রমণ। ধারণা করা যায় এই পূজা সূর্য পূজারই সামিল। ভুষো কালিমাখা মাটির হাড়ি ভাঙার অর্থ সম্ভবত অন্ধকার বিনাশ করে সূর্যের প্রকাশের প্রতীক। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু এ সম্পর্কে বলেছেন— কোন কোন মনীষী মনে করেন ঘেঁটু হলেন, ঘাঁটু হলেন চর্মরোগের আরোগ্য দেবতা— সূর্য অথবা ধর্মঠাকুরের লৌকিক সংস্করণ। তাঁদের অভিমতের সমর্থনে বলা যায়, সূর্য ও ধর্ম ঠাকুর উভয়েই কুষ্ঠ এবং নানারূপ চর্মরোগের নিরাময়কারী দেবতা, ঘাঁটুর সঙ্গে উভয়ের প্রকৃতিগত মিলও আছে, অনেক স্থানে ঘাঁটুর প্রতীক শুধুপ্রদীপই দেখা যায়, ধর্মশিলা হাঁড়ির মত গোলাকার, তার ওপর ধাতু নির্মিত দুটি চোখ থাকে। কিন্তু নানাদিক থেকে একটি ধারণা করা যায়, হয়তো এই আরোগ্য দেবতাটি (এঁর পিশাচকুলে জন্ম বলে অখ্যাতি আছে) ইনি আর্যেতর সমাজ উদ্ভূত।[৮]

আটেশ্বর দেবতার ব্রত : আট মানে উঁচু জমি। এই দেবতা উঁচু জমিতে বসে সবদিক দেখেন বা রক্ষা করেন তাই এঁকে আট বলে। বাংলার সমাজে আট কথাটি বেশ প্রচলন। যেমন— আটকুঁড়ে, আটঘাট বাধা, আটকপালে ইত্যাদি। আবার আট শব্দের যে আভিধানিক অর্থ পাওয়া যায় সেখানে আট মানে বন। অন্যদিকে বন শব্দটির সমার্থক হল অটবি। সুতরাং সংস্কৃত অটবি থেকেও এই আট শব্দটি আসা কষ্টকল্পনা নয়। যেমন অটবি > আটবি > আটি > আট। আর আট থেকেই আটেশ্বর শব্দটি এসেছে বলে ধারণা করা যায়। গ্রামীণ লোকেরা আগে বন আর নদীকেই জানত এবং এই দুটো বিষয়ে সর্বদা সাবধান হত। তাই বলতেন 'আটঘাট বেঁধে চলবে'। তাঁদের ওঝাদের মন্ত্রেও 'আটঘাট বন্ধনের কথা আছে। সেই থেকে বনদেবতার নাম— আট' দেবতা। পরে কিছুটা আর্যিকরণ হয়ে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে 'আটেশ্বর' হয়েছেন।'[৯]

মালদানী ব্রত : উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ সন্নিহিত অঞ্চলে মালদানী দেবীর পূজার প্রচলন আছে। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে গ্রামদেবতার পূজার সময় এই দেবীর পূজা সম্পন্ন হলেও গ্রামের কোনো বিপদ আপদ ঘটলে এই দেবীর পূজা করবার রীতি লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত জলাশয়ের ধারে মালদানী দেবীর পূজা হয়ে থাকে। এতদঞ্চলের দেশি, পলি, রাজবংশী সমাজ আজও ভক্তিভরে এই পূজা করে থাকেন। লোকশ্রুতি, গ্রামের কোনো পরিবারের বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন হলে মালদানী দীঘিতে থালা-বাসন পাওয়া যেতো বলে বিশ্বাস করতো। এছাড়া বিবাহের জন্য দেবীর কাছে মানত করলে টাকাকড়ি পাওয়া যেত বলে লোকেরা বিশ্বাস করত। এই দেবী সম্পর্কে ড. দীপককুমার রায় বলেছেন—

> "গ্রামের মানুষ অসুস্থ হলে এই দেবীকে দুধ, কলা, ফলমূল দিয়ে পুজো করেন। অত্যন্ত জাগ্রত দেবী; লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে অনুমান করা যায় মালদানী উর্বরতা-তন্ত্রের দেবী। কৃষি ফসলের কামনায় স্থানীয় মানুষ পুজো করেন।"[১০]

এখন প্রশ্ন হল এই মালদানী শব্দটির কীভাবে সৃষ্টি হল? শব্দটির আভিধানিক ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থই বা কি? আমাদের মতে দেবী যেমন লৌকিক, তেমনি শব্দটিও লৌকিক হওয়াই স্বাভাবিক। শব্দটির ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় যিনি মাল দান করেন। মাল + দান = মালদান। আর যিনি মালদান করেন তিনিই মালদানী। লোকশ্রুতিতেও সে কথার সাক্ষ্য মেলে। পল্লীবালারা তাদের বিশ্বাস মতে শুধু দেবদেবীর পুজো-আর্চ্চাই করছেন তাই নয়, সেইসঙ্গে দেবদেবীর বৈশিষ্ট্য অনুসারে নামকরণ করার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 47
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 403 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কুলের মাগন বা কুলাইর ব্রত : পৌষমাসের রাতে গ্রামের রাখাল-বালক-যুবকেরা গৃহস্থের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে নতুন ধানের চাল তরিতরকারি মাগন করে এবং কোথাও কোথাও নগদ অর্থও সংগ্রহ করে। এই মাগনকৃত চালডাল, অর্থ দিয়ে পৌষসংক্রান্তিতে কুলাই ঠাকুরের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করা হয় এবং সবশেষে সকলে একত্রে বসে কুলাই ঠাকুরের প্রসাদ ভক্ষণ করে থাকে।

গবেষকদের মতে এই কুলের মাগন বা কুলাইর ব্রতটি আদিম ধারণা জাত। সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল গোষ্ঠীর ভাষায় 'কুল' শব্দের অর্থ বাঘ। খেরোয়াল গোষ্ঠীর যে শাখাটি বাগাল বা রাখালের কাজ করত তাঁরা 'কুলাই' বা বাঘের ব্রত পালন করতো। কালক্রমে সেই বাগাল বা রাখালের দল হিন্দু সমাজের বিভিন্ন জাতে বা সম্প্রদায়ে মিশে গিয়েছে। তারাই এই আদিম সংস্কারটি এখনো পালন করে থাকে।[১১] সুতরাং ধারণা করা যায় গৃহস্থের সন্তানসন্ততি এবং গোরু-বাছুর যাতে করে বাঘের উপদ্রব বা আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় তারজন্যই রাখাল-বালকদের মূলত এই ধরনের ব্রতানুষ্ঠান। উল্লেখ্য, এই ব্রতের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ কৌমের পরিচয় লুকিয়ে আছে।

কুক্কট ব্রত বা কুক্কুটি ব্রত : বন্ধ্যানারীদের বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে ভাদ্র মাসে শুক্লসপ্তমীতে কুক্কুটব্রত পালন করা হয়ে থাকে। মূলত রাঢ় বঙ্গে এই ব্রতটির বহুল প্রচলন। পূর্বে অষ্টম বর্ষীয়া থেকে দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাদের বিবাহ প্রচলন ছিল। বিবাহের পরে আরও দুই-তিন বৎসর সন্তানসন্ততি না হলে লোকবিশ্বাস মতে তাঁকে কুক্কুট বা কুক্কুটিব্রত পালন করতে হত। কুক্কুটি আসলে শিবেরই আরেক নাম। শিব আসলে কৃষি বা কর্ষণের দেবতা। পৌরাণিক মতে শিবলিঙ্গের পুজা লক্ষ্য করা যায়। লিঙ্গ কথাটিও এসেছে লাঙ্গল শব্দ থেকে। যার কাজ কর্ষণ করা। অন্যদিকে লৌকিক অর্থে কুক্কুট মানে মোরগ। মোরগ বহু প্রজননের প্রতীক। মুরগী একসঙ্গে প্রচুর বাচ্ছা দিয়ে থাকে। সুতরাং অনুকরণাত্মক জাদুবিশ্বাস থেকে সন্তানহীনা নারীরা এই ব্রত পালন করে থাকে। বলাবাহুল্য গ্রামবাংলায় ঘরে ঘরে মুরগীপালনও এই জাদুবিশ্বাস থেকেই বলে ধারণা করা যায়।

নাটাইঠাকুর ব্রত বা নাটাইচণ্ডী ব্রত : অগ্রহায়ণ মাসের প্রত্যেক রবিবার এই নাটাই ঠাকুরের পূজা গৃহস্থের উঠোনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নতুন চালের গুড়ো দিয়ে নাটাই ঠাকুরের মূর্তি উঠোনের মধ্যেই আলপনা দিয়ে তৈরি করা হয়। আলপনা দিয়ে রূপ দেওয়া মূর্তির পাশেই একটি ছোটো করে পুকুর কাটা হয়। পুকুরটি দুধ ও জল দিয়ে পূর্ণ করা হয়। পূজার উপাচার হিসেবে জলপূর্ণ ঘট, দূর্বা, তুলসি, একটি আম্রপল্লব, ভেরেণ্ডাপাতা বা কচু পাতা লাগে এবং নৈবেদ্য হিসেবে নতুন ধান্যর চালের ছোটো করে তৈরি পিঠে (আলুনি ও নুনসহ), ফলমূল ইত্যাদি দেওয়া হয়।

লক্ষণীয় বিষয় হল নাটাই পূজার সময়কাল। কালটা অগ্রহায়ণ মাস। পূর্বে অগ্রহায়ণ মাস থেকেই বছর গণনা শুরু হত। বলা বাহুল্য অগ্রহায়ণ শব্দটির মধ্যে তা লুকিয়ে আছে। অগ্র + হায়ণ = অগ্রহায়ণ। অর্থাৎ অগ্র যে সময় বা মাস তাই অগ্রহায়ণ। পৃথিবীর সর্বত্র নতুন শস্যকে কেন্দ্র করে উৎসব করার রেওয়াজ আছে। কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি যেহেতু শস্য তাই সেই শস্য যখন নতুন থাকে কিংবা শস্যকে যখন ঘরে তোলা হয় সেই উপলক্ষ্যে যে উৎসব তাই হল নবান্ন।[১২] আর অগ্রহায়ণ মাস হল কৃষি ব্যবস্থার প্রকৃত ফসল তোলার মাস। বছরের শুরুতে নাটাই পূজা করলে গৃহস্থের সমৃদ্ধি আসবে, এই ভাবনা থেকেই এই ব্রতের আয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বৈশাখ মাস থেকে বছর আরম্ভ করার রেওয়াজ অনেক অর্বাচীন।

নাটাই শব্দটি নিয়ে নানা জনে নানা মতো ব্যাখ্যা করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে যেটি আমাদের মনে হয়েছে তাহল, ঢেঁকিকে গ্রামীণ সমাজে অনেকে নুট বলে থাকে। নুটের তৈরি চালের গুঁড়ো দিয়ে নাটাই ঠাকুরের আলপনাকৃতিকেই নাটাই ঠাকুর হিসেবে কল্পনা করা হয় এবং নুটের তৈরি চালের গুঁড় দিয়েই পিঠে তৈরি করে নাটাই ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়। আমরা বলতে পারি— নুট > নুটাই > নাটাই এইভাবে শব্দটি আসা অস্বাভাবিক নয়। নুটের বা চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি মণ্ডকে বলা হয় নোতা। নোতা মানে গ্রামীণ মেয়েলি ভাষায় নরম তুলতুলে। যেমন— বেশ নোতা নোতা হয়েছে। এছাড়া আরেকটি বিষয়ও আমাদের খেয়াল রাখতে হয়। নুট গৃহস্থ বাড়ির জন্য একটি অপরিহার্য অঙ্গ, অন্তত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 47
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 403 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যন্ত্র উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত। সুতরাং সেই নুটের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কৃষিজীবী সমাজ নুটের একটি কাল্পনিক মূর্তি রচনা করে এই পূজায় সামিল হয়েছে। সবশেষে এই ব্রতে কথা বা কাহিনি রয়েছে যা গৃহস্থের সকল সদস্যকে শোনানো হয়।

টুসু : রাঢ় অঞ্চলের একটি লৌকিক উৎসব। অনেকে টুসুকে শস্যোৎসবও বলে থাকেন। পৌষ মাসে ধান কাটা সারা হলে যখন পিঠেপুলির আয়োজন চলে সে সময়ে টুসুকে আলতা পরিয়ে সোনার খাটে হেলান দিয়ে রুপোর খাটে পা দিয়ে শুইয়ে রাখা হয়। টুসুর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো পৌরাণিক মন্ত্র-তন্ত্রও নেই। এমনও ধারণা করা হয়, পশ্চিমবাংলার তুষতুষলি ব্রতই হল পশ্চিম সীমান্ত বাংলার টুসুব্রত।

এখন জেনে নেব টুসু নামটি উদ্ভবের ইতিহাস। অনেকে মনে করেন উড়িষ্যার পাহাড়ী অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ওষা বা ঊষা নামে একধরনের ব্রত পালন করে থাকে। এই ঊষা বা ওষা শব্দটিই উচ্চারণ ভেদে পশ্চিম-সীমান্ত বাংলায় টুসুতে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে আরেকটি মত হল পৌষমাসে টুসুব্রত পালন হয়ে থাকে তাই পৌষের সঙ্গে এর যোগ থাকাটা স্বাভাবিক। পৌষমাস পুষ্যা নক্ষত্রজাত। পুষ্যা নক্ষত্রের অপরনাম তষ্য। তষ্য থেকেই তুষ্যা > তুষু > টুসু কথাটি এসেছে। আবার এমনও বলা হয় যে কোল গোষ্ঠীর 'টুসা' শব্দ থেকে টুসু শব্দটি এসে থাকতে পারে। আরেক দল গবেষক মিশরের টেসুব বা টুসুব দেবতার সঙ্গে টুসুর মিল দেখতে পান।

একথা ঠিক যে সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ যে সাংস্কৃতিক যাত্রা শুরু করেছিল তার সঙ্গে কালক্রমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আচার-সংস্কৃতির গ্রহণ-মিশ্রণ-আত্তীকরণ ঘটেছে। সে সম্পর্কে আজ অধিকাংশ গবেষকের ধারণা ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। তাই উপরোক্ত ভাবনাগুলিকে সম্মান জানিয়ে আমরা বলতে চাই যে পৌষমাসে যেহেতু ফসল তোলবার মাস, সেই ফসলকে শ্রদ্ধা জানাতে ধানের খোসা অর্থাৎ তুষ দিয়ে এই টুসু দেবতার মূর্তি তৈরি করা হয়। তাই তুষ শব্দটি থেকে টুসু দেবতার উৎপত্তি সংক্রান্ত ধারণাটি করা যেতে পারে। তুষ > তুষু > টুসু। বিশেষত পশ্চিম বাংলায় পৌষমাসে তুষতুষলি ব্রত পালন করবার রীতি প্রচলিত আছে।

ব্রতকথা শুধু ধর্মীয় আচার নয়; এটি বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি এবং ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর উৎস সন্ধান আমাদের বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের গভীরে প্রবেশের সুযোগ দেয়। তাই ব্রতকথা চর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে আমরা আমাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে আরও সমৃদ্ধ হতে পারি। লৌকিক দেবতা ও পূজাপার্বণ প্রসঙ্গে শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বিখ্যাত 'বাংলা মঙ্গলকাবতের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন—

> "ইহাদের সহিত পৌরাণিক হিন্দুধর্মের কোন সম্পর্ক নাই ... কিন্তু আলোচনা দ্বারা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান অধ্যায় সংযোজিত হইতে পারে ... বাংলার নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় ইহার মূল্য অপরিসীম।" শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক মনে করেন, "যে পর্যন্ত না কেহ এদেশের লৌকিক দেবতার বিষয় লিখছেন সে পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অলিখিত থাকবে।"[১৩]

সবচেয়ে বড়ো কথা এই সমস্ত লৌকিক আচার সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে যে Text, Context গড়ে উঠেছে এবং তা যে Texture এর মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে তা কিন্তু এই বাংলার ভাষা, বাংলা ভাষায়। সুতরাং বাংলা শব্দভাণ্ডার এগুলির ওপর বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলার একটি বৃহৎ ভৌগোলিক সীমারেখার মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে-যাপনে-মননে যে ভাষা ও সংস্কৃতি লালন-পালন করে থাকে তা বাংলা ভাষার ধ্রুপদী হয়ে ওঠার পিছনে সর্বাধিক অবদান রেখেছে।

ব্রতকথার মাধ্যমে বাংলার ভাষা ও সাহিত্যে অনেক নতুন শব্দ, রীতি ও কাব্যধর্মী ভাবনা বাংলা ভাষায় যুক্ত হয়েছে। বিশেষত, ব্রতকথার শব্দ ও বাক্যগঠন সরাসরি বাংলার লোকজ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বলাবাহুল্য, একটি ভাষা শুরুতে থাকে তার মৌখিক রূপ। মৌখিক রূপগুলিই কালক্রমে লেখ্যসাহিত্যে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং একটি ভাষার সমৃদ্ধির পিছনে এই সব লৌকিক বা মৌখিক পরম্পরা অর্থাৎ আচার, ব্রতপার্বণ, গান, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, নৃত্যকলা, আলপনা ইত্যাদির অবদান অস্বীকার করা যায় না।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 47
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 403 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লৌকিক কথাটি এসেছে 'লোক' থেকে। শঙ্করাচার্য সামান্য 'লোক'কে বলেছেন 'ইতর প্রাকৃতজন'। অর্থাৎ 'লোক' এখানে অবজ্ঞার পাত্র হিসেবে চিহ্নিত। ভারতীয় দর্শনের একাংশের কাছে; বিশেষত উচ্চবর্গীয় প্রভুদের কাছে বস্তুবাদী 'লোকায়ত' ছিল অপাংক্তেয়। সম্ভবত খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে 'লোকায়ত' শব্দটির আবির্ভাব। মাধবাচার্য 'লোকায়ত'কে চার্বাকের দর্শনের অপর নাম বলে থাকেন। আবার আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'লোকায়ত' যদি সাধারণ মানুষের মত প্রবণতা বা দর্শন বোঝায়, কিংবা ইহলোক সর্বস্ব বস্তুবাদী দর্শন বোঝায় তাহলে এধরনের মতবাদের উৎস প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে।

সুতরাং অনুমান করা যায় ভারতীয় দর্শনের একাংশ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আধিপত্যের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া থেকে চার্বাকদের আবির্ভাব। ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ইত্যাদি ধারণা সমাজে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অনুকূলে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। কারণ এইসব ধারণার সাহায্যে নিম্নবর্গের আনুগত্যলাভ করতে তাঁদের বিশেষ সুবিধে হয়। এজন্মের কর্মফল পরজন্মে পাওয়া যাবে বলে মানুষকে দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম করিয়ে নেওয়া যায়। এসবের প্রতিবাদেই চার্বাক দর্শনের জন্ম। 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ' অর্থাৎ ঋণ করে হলেও ঘি খাও, যতদিন বাঁচো সুখে বাঁচো; 'যা দেবে অঙ্গে তাই যাবে সঙ্গে' ইত্যাদি বাক্যবন্ধের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে লোকায়ত দর্শন বলতে কি ঠিক তাই মানে করছে? আমরা যেসব ব্রতকথা আলোচনা করলাম বা আরও যেসব ব্রতকথা বাংলায় লোকায়ত সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার সবকিছুর মধ্যে কোথাও না কোথাও ঈশ্বরের অনুসঙ্গ কাছ করেছে। তাঁদের ব্রতকথায় যেসব দেবতাদের উল্লেখ আছে তাঁরা হয়তো পৌরাণিক দেবদেবী নয় কিন্তু সেটাই বা কম কিসে? তাই বলা যায়, লোকায়ত' শব্দটি অনেক ব্যাপকতর। সুতরাং চার্বাক ছাড়াও বস্তুবাদী চিন্তা করতেন এমন অনেক দার্শনিক এই ভূ-ভারতে ছিলেন। সঙ্গত কারণেই ভারতীয় লোকায়ত বস্তুবাদের বহুমুখ ও বিভিন্নমুখী বিস্তার লক্ষ করা যায়। আর সে কারণেই বাংলা ব্রতপার্বণের উৎসসন্ধানে মনোনিবেশ করলে উপলব্ধি হয় বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রক্রিয়া একটি প্রাচীন, জটিল এবং বহুমাত্রিক ও বহুমুখী বিবর্তনের পথ পরিক্রমা।

Reference:

১. রায়, নীহাররঞ্জন : বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশার্স, ১৪০০, পৃ. ৪৮
২. সেন, শ্রী ক্ষিতিমোহন : জাতিভেদ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৫৩, নিবেদন অংশ, পৃ.৮
৩. ঐ, পৃ. ৯
৪. ঐ, পৃ. ৬৪
৫. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ : বাংলার ব্রত, ১৪০২, পৃ. ৫
৬. ঐ, পৃ. ৬
৭. ঐ, পৃ. ৬৫
৮. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ : বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৮৬
৯. ঐ, পৃ. ৩৮
১০. রায়, ড. দীপক কুমার : উত্তর দিনাজপুর জেলার লৌকিক দেবদেবী, এপ্রিল, ২০২৪, পৃ. ১৯
১১. ভৌমিক, সুহৃদকুমার : লোকশ্রুতি পত্রিকা, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৪০২, পৃ. ১৫৩
১২. সেনগুপ্ত, পল্লব : পূজা-পার্বণের উৎসকথা, পৃ. ১১৫
১৩. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ : বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৮